কলেজ রি ইউনিয়ন

সুশান্ত কুমার সান্যাল

ভার্চুয়াল জগতের দৌলতে আজ তারা এক সাথে হতে চলেছে বহু বছর পর। ১৯৮৯ সালের কোন এক কলেজের কমার্স অনার্সের একটা ব্যাচ।এখন যেটা আক্ষরিক অর্থে হল রি ইউনিয়ন।বছর ত্রিশের ব্যবধান গড়ে দিয়েছে তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা পথ ও ভাগ্য।এদের মধ্যে আজ কেউ উকিল কেউ বা সরকারি কেরানি আবার কেউ বা উচ্চপদে আসীন কোন বেসরকারি বা সরকারি অফিসে কর্মী। ব্যতিক্রম দেবা (ভাল নাম দেবাসিশ) সে এখন রাজনীতির পরিমণ্ডলে আবদ্ধ, কারন আজ সে শাসক দলের একজন বিধায়ক।অথচ যে দেবার ওপরই নাকি ভরসা করতে পারত না কেউ, আজ সে কিনা নিজেই ভরসা একটা গোটা বিধানসভা কেন্দ্রের ?ভাবতেই পারছে না রঞ্জনা।আজ এদের অপার আনন্দ, কে কেমন হয়েছে চাক্ষুস দেখার।দিল্লি থেকে আসছে সুজয়, বরাবরই মেধাবী ছাত্র সে। কলেজের পাঠ শেষ করে বিদেশের কোন একটা পড়াশোনা চুকিয়ে সে নাকি একটা বহুজাতিক সংস্থার সি ই ও ।প্রচুর নাম ডাক তার।তিন্নির কলেজ জীবনের প্রথম প্রেমিক।তাই তিন্নির আগ্রহ টা সবচেয়ে বেশি তাকে দেখার।আসবে রেলের সিনিওর কমার্শিয়াল ম্যানেজার কিংশুক চ্যাটার্জি, কথায় কথায় যে কোন ট্রেনের টিকিট কনফার্ম করে দিতে পারে আজ সে। শ্রেয়ার কলেজের প্রেমিক সুদীপ আজ বড় ফুটবলার,প্রেম করে বিয়েও হয়েছিল, কিন্তু টেকে নি বেশি দিন। অনেক দিন পরে দেখা হবে দুজনের, যদিও দুজনের আজও দ্বিতীয় বার আর বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি। এদের মধ্যে একটা বর্ণময় চরিত্র পিন্টুর। সবার মধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল ও মেধাবী। এই ব্যাচের মধ্যে সবচেয়ে আন্তরিক ভাবে চাকরির চেষ্টা শুরু করেছিল সবার আগে কিন্তু কোন চাকরি তেমনভাবে জোটে নি। আজও ৫২ বছর বয়সে চেনা জানা লোকজনকে দেখা হলে বলে একটা ভাল চাকরি খুঁজে দিতে।কেউ কেউ হাঁসে আবার কেউ মজা করে তাকে নিয়ে, কিন্তু সে সত্যি সিরিয়াস। এই পুনঃমিলনের আসরে সে প্রথমে না করেছিল কারন তার কাছে ঠিক পুজার মুখে দু হাজার টাকা একেবারেই সম্ভব নয়।তার মায়ের ক্যান্সার, তাই এই সামান্য পয়সা তার কাছে বিরাট অঙ্কের ধাক্কা। কিন্তু কে কার কথা শোনে ।তিন্নি বা রঞ্জনা তার কথায় আমল না দিয়েই তার হয়ে পয়সা দিয়ে দিয়েছে হয়তো বা আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে কলেজ কান্টিনে সেই জমজমাট আড্ডার মধ্যমনি পিন্টু কে মনে করেই। কে বলতে পারে কাল কি হবে ?

সকাল সাড়ে ১০টা। দক্ষিণ কলকাতার সেন দের বাগান বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল একটা টয়োটা ইনোভা। একজন কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক নেমে প্রবেশ করল ভিতরে।সামনেই দাঁড়িয়েছিল শ্রেয়া, দেখেই চিনতে পারে এই সেই সুজয়।শ্রেয়া দৌড়ে কাছে চলে এসে প্রশ্ন করে ,কেমন আছিস সুজয় ? নিশ্চয়ই খুব ভাল ? কবে বিদেশ থেকে ফিরলি ?সুজয় একটু গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয় এর থেকে ভাল জায়গা পেলি না কলকাতায় ? তোরা কি আজম্মকাল এই গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকবি ? মনে মনে রাগ হলেও প্রকাশ করল না শ্রেয়া, শুধু একটু মুচকি হেঁসে বলল " তুই এসে ব্যবস্থা করিস পরের বার।দুজনে গিয়ে বসলো পেতে রাখা সারি সারি চেয়ারের মধ্যে।সামনের টেবিলে গোটা কতক দামী ফোন রেখে ডুবে গেল সুজয় আর শ্রেয়া পুরনো দিনের গল্পে। সুদীপ এলো তার সখের বাহন নতুন কেনা দামী বাইকে চড়ে, আসার সময় জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে পিনটুকে। সবার আগ্রহ ছিল পিন্টু কে দেখার কারন এই ব্যাচের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম সেই যার কাছে স্মার্ট ফোন নেই। দু এক বছর আগে কিংশুক একটা ফোন তাকে দিয়েছিল বটে তবে সেটা জলে ভিজে খারাপ হয়েছিল কিছু দিনের মধ্যেই, সারান হয় নি আজও পয়সার অভাবে, কারন তার যা রোজকার তার প্রায় পুরোটাই চলে যায় মায়ের দু একটা ওষুধ কিনতে।তাই সোশ্যাল মিডিয়াতে তার ছবি কেউ দেখতে পারে না।সবাই ব্যস্ত আজকের তাই কারুর কাছে গিয়ে তাকে ব্যস্ত করায় নারাজ পিনটু।আজ প্রায় ৩০ বছর পর সুজয়ের মুখোমুখি সে।সময় গড়ে দিয়েছে বড় দেওয়াল। সুজয় কিছু সময় তার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো " কেমন আছিস ভাই ?" পিন্টু ঘার নেড়ে জানাল "চলছে "। সুজয়ের মনে পরে গেল এক মাত্র তার কাছেই বার বার হারতে হত তাকে কলেজের পরীক্ষার নাম্বারে।কি শার্প ছিল তার বুদ্ধি, হাজার বার চেষ্টা করেও সুজয় কোন দিন পারে নি তাকে টপকাতে অথচ আজ কিনা সেই পিন্টুর এই অবস্থা ?সুজয়ের দিকে তাকেই পিন্টু বলল কি ভাবছিস সুজয় আমার দিকে তাকিয়ে, এবার থেকে কিন্তু জামায় লিখে রাখব " তাকিয়ে লজ্জা দিবেন না "। সবাই মিলে হাসতে আরম্ভ করে এই কথায়। মনে পড়ল পুরনো পিন্টুকে।কলেজের সব চেয়ে সুদর্শনা ছিল পলি, এসেছে সে তার ইঞ্জিনিয়ার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। কে বলবে তার এত বড় ছেলে।চেহারায় এখনও যে কোন কলেজের মেয়েকে টক্কর দিতে পারে সে। তিন্নি বলে পলি মনে আছে সেই পড়া না পারার দিন গুলো ? কারন তিন্নির পাশের বাড়িতেই থাকত পলি।আর একই মাস্টার ছিল তাদের দুজনের। দুজনেই সে মাস্টারের কথা বলে হাসতে আরম্ভ করে। অর্ক, শেফালি ও কুমারেশও এসেছে। কুমারেশ এখন এক রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার । উকিল হিসেবে শেফালির একটু নাম ডাক হয়েছে আর তার বিশেষত্ব হল এই ব্যাচের মধ্যে প্রথম লিভ টু গেদার ধারনা বাস্তবে করেছিল সে আর সে অর্থে সে সবার থেকে আধুনিকা।অর্কর রয়েছে ক্যাটারিং এর ব্যবসা, আজকের খওয়া দাওয়া তারই হাতে। এসেছে অনিতা তার অভিনেতা বর জিতেশ কে সঙ্গে নিয়ে।বাবা মার অমতে বিয়ে করেও আজ সে সুখি। গাড়ি বাড়ি বা চাকর কোনটার অভাব নেই আজ।শুধু হাহাকার কোন সন্তান না থাকার। সুজয় আড় চোখে একবার দেখে নেয় অনিতাকে।পিন্টু কে দেখে অপার বিস্ময় তাকিয়ে থাকে অনিতা, মুখ ফুটে বলে ফেলে কি অবস্থা হয়েছে তোর ? স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে পিন্টু উত্তর দেয় তোকে বিয়ে না করতে পেরে দেবদাস, সবাই হেঁসে ওঠে একসাথে। অনিতার বর জিতেশ বেশ ভাল ছেলে ,পিন্টুকে কাছে ডেকে বলে আপনার কথা অনেক শুনেছি ওর কাছে, সব সময় মাতিয়ে রাখতেন কলেজ। মাথা নাড়ে সে।এর মধ্যেই বেশ কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হয়। খাবার আয়জনে হল ঘর পরিপূর্ণ। সবার চোখের আড়ালে অনেক পুরনো প্রেম আবার নতুন করে জেগে উঠেছে ততক্ষণে। হটাত নজরে এলো পিন্টু নেই।কোথায় সে ?সুদিপ ,রঞ্জনা বা তিন্নি কেউই দেখে নি তাকে। তিন জনেই একসাথে বেড়িয়ে এলো বাইরে ছেলেটাকে ধরে এনেও রাখা গেল না। সুজয় বলল সবাই কে আজও বুরবক বানাতে ওর জুরি নেই। নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও একটা জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে আছে সে। বাইরে বেড় হয়ে দেখা মিলল না তার।মেন রোডে উঠে তারা দেখতে পেল বড় একটা মিছিল আসছে , সবার হাতে প্লাকার্ট।তাতে লেখা " ভিক্ষা নয়, কাজ চাই "। কোন এক অব্যাক্ত কারনে তিন জনের চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। রঞ্জনা ও তিন্নির নিজেদের প্রশ্ন করতে লাগল তাহলে পিন্টুর হয়ে টাকা দেওয়া কি তাদের ঠিক হয় নি ?

দু এক বছর আগে কিংশুক একটা ফোন তাকে দিয়েছিল বটে তবে সেটা জলে ভিজে খারাপ হয়েছিল কিছু দিনের মধ্যেই, সারান হয় নি আজও পয়সার অভাবে, কারন তার যা রোজকার তার প্রায় পুরোটাই চলে যায় মায়ের দু একটা ওষুধ কিনতে।

দীপেন্দু চৌধুরী

শতবর্ষের দোরগোড়ায় কুশকাঠির মণ্ডপ

রাধানগরের সন্তান পশুপতি মিত্র কর্মসূত্রে থাকতেন কলকাতায়।তিনি কোর্টে মুহুরির কাজ করতেন। থাকতেন ঠনঠনিয়া কালী বাড়ির কাছে একটা মেসবাড়িতে।কাছেই ছিল সিমলা ব্যায়াম সমিতি।

শারদোৎসব বলি বা দুর্গাপুজো। শরৎকাল এলেই কাশফুলের সমারোহ। দুর্গাপুজোর আহ্বান আমাদের টেনে নিয়ে যায় শিউলিতলার স্মৃতির বারান্দায়। নীল আকাশে পেঁজা পেঁজা মেঘ শরৎকালে শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মত আমাদের কুটুম বাড়ির আত্মীয়তা চেনায়। পুজোর লেখা ভাবতে বসে আমার মনে পড়ল হুগলি জেলার খানাকুল- ১ ব্লকের রাধানগর গ্রামের পুজোর কথা। এই রাধানগর গ্রামেই জন্মেছিলেন ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়। সত্যিই আমাদের বিস্মৃত হতে হয় এই গ্রামের কথা আলোচনা করতে গেলে। এই গ্রামের দুর্গা পুজো নিয়ে একটা চাপা গুঞ্জন আছে। রাজা রামামোহন রায় পৌত্তলিকতা বিরোধী ছিলেন। তাঁর জন্মভিটেয় দুর্গাপুজো? ৯২ বছর আগেই এই প্রশ্নটা উঠেছিল। রামমোহন গবেষক তথা জীবনীকার ডঃ পরেশচন্দ্র দাস বলছেন, রাধানগরের শতবর্ষের ঐতিহ্য সম্পর্কে ভাবতে গেলে যে কথাটা মনে আসে তা হল বিশ্বপথিক রামমোহনের জীবনচর্চা ও জীবন দর্শন। তাঁর নির্দেশিত তত্ত্বের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান করেছেন তিনি। রাধানগরের দুর্গাপুজো শতবর্ষের দোরগোড়ায়। রাধানগর পল্লী সমিতি বিগত ৯৯ বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত। সামনের বছর রাধানগর পল্লী সমিতি গর্বের শতবর্ষ উদযাপন করবে।রাধানগরে রয়েছে আরও একটি প্রতিষ্ঠান, আনন্দময়ী স্পোর্টিং ক্লাব। এই ক্লাবটিও সামনের বছর শতবর্ষ ছোঁবে। রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি বিজড়িত একটি প্রত্যন্ত গ্রামে সহোদরা ভাইবোনের মতই তিনটে সংস্থার পথ চলা।যেন সাংস্কৃতিকভাবে বহতা একটি নদীর তিনটে পৃথক শাখা। রাধানগরে আজ থেকে ৯২ বছর আগে বারোয়ারি দুর্গাপুজো হত না। রাধানগরের সন্তান পশুপতি মিত্র কর্মসূত্রে থাকতেন কলকাতায়।তিনি কোর্টে মুহুরির কাজ করতেন। থাকতেন ঠনঠনিয়া কালী বাড়ির কাছে একটা মেসবাড়িতে।কাছেই ছিল সিমলা ব্যায়াম সমিতি। এই ব্যায়াম সমিতির বারোয়ারি দুর্গাপুজো দেখে পশুপতি মিত্রের খুব ভাল লাগে। তাঁর মনে হয় তাঁরাও তাঁদের গ্রাম রাধানগরে বারোয়ারি দুর্গাপুজো করতে পারেন। সেই মত বাংলা ১৩৩৮(ইংরেজি ১৯১৪)সালে কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রাধানগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি গঠন করে গ্রামে পুজো শুরু করেন।এই পুজো শুরুর সময় থেকেই খানাকুল-১ ব্লকের পাঁচটা গ্রাম রাধানগর, সাহানপুর, রাধাবল্লভপুর, কোটরা এবং গোপীনাথপুরের মানুষের একমাত্র পুজো ছিল। ৯২ বছর আগে শুরু হওয়া এই পুজোর আকর্ষণ আজও সমানভাবে পাঁচটা গ্রামের প্রায় সাড়ে চার হাজার, পাঁচ হাজার মানুষের কাছে রয়ে গেছে। এলাকার অন্যতম পুজো হিসেবে। মাত্র ১৮ টাকা চাঁদা উঠেছিল সেই বছর। প্রথম বছর পুজোর বাজেটও ছিল মাত্র ১৮ টাকা।যদিও রাধানগর পুজো কমিটির এই বছরের পুজোর বাজেট এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা।

প্রথম বছরের পুজোর ইতিহাস মনে করে বললেন রাধানগরের প্রাক্তন শিক্ষক তথা সমাজসেবী বাসুদেব বসু। তাঁর বয়স ৭২ বছর।গ্রামের প্রথম বছরের পুজো তিনি নিজে চোখে না দেখলেও তাঁর বাবা এবং দাদাদের কাছে শুনেছেন। তাঁর কথায়, পশুপতি মিত্র রাধানগর গ্রামের পুজোর প্রথম উদ্যোক্তা। তিনি কলকাতায় যে বছর সিমলা ব্যায়াম সমিতির সার্বজনীন পুজো দেখেন তার পরের বছর অর্থাৎ বাংলা ১৩৩৮ সালে আমাদের গ্রামে পুজোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল রাধানগরের সমবয়সী বন্ধুরা। তার মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত কবিরাজ তারকনাথ গুপ্ত, তন্ত্রসাধক পরিবারের প্রবোধচন্দ্র আগমবাগীশ ছিলেন।১৩৩৮ সালে রাধানগরের প্রথম সার্বজনীন দুর্গাপুজো আগমবাগীশদের বাড়ির বৈঠকখানায় হয়েছিল। এবং পাঁঠাবলিও হয়েছিল। কারণ আগমবাগীশদের নিজস্ব কালী বিগ্রহ আছে। ২০০ বছরের পুরনো এই কালী মন্দিরে আজও মা কালীর পুজো নিয়মিত হয়। এবং পাঁঠা বলি হয়। ১৩৩৯ সালে রাধানগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো নিজের জায়গায় উঠে আসে।অঞ্চলের গুপ্ত পরিবার দুর্গোৎসব কমিটিকে ১৫ কাঠা জমি দান করে। সেই জমিতেই আজও পুজো হচ্ছে।দ্বিতীয়বারের পুজো মণ্ডপ তৈরি হয়েছিল কুশ গাছ দিয়ে।কুশগাছ পরিচিত কুশাসন তৈরির জন্য। যে আসনে বসে তৎকালে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় পুজার্চনা করতেন। এবং প্রসাদ খেতেন। অব্রাহ্মণদের এই আসনে বসার অধিকার ছিল না।কুশ গাছের আঞ্চলিক নাম বেনা গাছ।আরামবাগ মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকাকে বলা হয় বন্যাপ্রবণ অঞ্চল।বিশেষত ডিভিসি ব্যারাজের ছাড়া জল অঞ্চলকে প্লাবিত করে। এই প্রসঙ্গে পশুপতি মিত্রের ছেলে ৬৯ বছরের প্রভাত মিত্র বলেন, বাবার কাছে শুনেছি, কুশ গাছ নদীর জল ভেঙ্গে নিয়ে এসে অস্থায়ী মণ্ডপ তৈরি করা হত। সারা বছর আমাদের অঞ্চল জলে ডুবে থাকত। তাই ডিঙ্গি নৌকা করে এই কুশ গাছ বা বেনা গাছ নিয়ে এসে মণ্ডপ বানান হত।

ডিভিসি অঞ্চল হওয়ার কারণে দামোদর, মুন্ডেশ্বরী ও অন্যান্য শাখা নদীর জলে এই অঞ্চল বানভাসী আগেও হত এখনও হয়। তবুও পুজো কোনওদিন বন্ধ হয়নি। কানা নদী বা দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়েই কুশগাছ বেশি পাওয়া যেত।কিন্তু সমস্যা দেখাদিল অন্যত্র। বন্যাকবলিত হওয়ার জন্য কুশগাছের মণ্ডপ প্রতি বছর ভেঙ্গে যেত। সম্বৎসর জল ভেঙ্গে ডিঙি নৌকতে কুশগাছ নিয়ে আসতেন পশুপতিবাবু এবং তাঁর বন্ধুরা।বানভাসি অঞ্চলের কথা বলতে গিয়ে বাসুদেববাবু ১৯৭৮ সালের ভয়াবহ বন্যার প্রসঙ্গ তোলেন। সেই বছরেও রাধানগরে দুর্গাপুজো হয়েছে।রাধানগরের বিখ্যাত সর্বাধিকারী পরিবারের কথা অনেকেই জানেন। এই পরিবারের ছয়জন সদস্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভ্য ছিলেন। এই পরিবারের অন্যতম সদস্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁর ‘স্মৃতি রেখা’ বইয়ে দুর্গম এই অঞ্চলের কথা উল্লেখ করেছেন।‘’..... রাত্রিশেষে ঘাটে পৌঁছিবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে অনর্থ উপস্থিত হইল। দাঁড় টানার শব্দে মোহমুগ্ধ হইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলাম, এমন সময়ে ডোবা গাছের ‘ডগা’য় লাগিয়া লোহার পার্টী বোঝাই একখানা নৌকার তলা ফাঁসিয়া গেল।‘’

গুপ্ত পরিবারের দেওয়া ১৫ কাঠা জমিতে এখন স্থায়ী মণ্ডপ হয়েছে। ১৯৬৪ সালে রাজা রামমোহন রায় কলেজ তৈরি হয়। সেই বছর কলেজের পাশেই নদীর পলি দিয়ে কলেজ কতৃপক্ষের ইঁট তৈরি হচ্ছিল। সেই ইঁট দিয়ে একই বছরে রাধানগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির স্থায়ী মণ্ডপও তৈরি হয়।

বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাবিত এই অঞ্চলের অন্যতম দুর্গা পুজো রাধানগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজোয় দু’তিনটি বিষয় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। অষ্টমীর দিন সন্ধিপুজোয় কালী কীর্তন হয়। গ্রামের কীর্তনিয়ারা কীর্তনগান করেন।পঞ্চমীর দিন ৫৫টা নারকেল দিয়ে সন্দেশ তৈরি করা হয়। এই সন্দেশ ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত মা দুর্গাকে দেওয়া হয়। এবং লক্ষ্মী পুজোতেও নারকেল সন্দেশ দেওয়া হয়। পঞ্চমীর দিন তৈরি করে এই সন্দেশ লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত রেখে দেওয়া হয়। পুজোর সময় ঠাকুর দেখতে যারা আসবে তাঁদের সবাইকে নারকেল সন্দেশ দেওয়া হবে।অন্যটিও অত্যন্ত প্রশংসনীয়, পুজোর সঙ্গে যারা যুক্ত যেমন প্রতিমা শিল্পী, ঢাকি, কুমোর(যারা মালসা সহ মাটির পাত্র তৈরি করে),মণ্ডপ যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতে নবমীর নৈবেদ্য পৌঁছে দেওয়ার রীতি এই কমিটির পুজোয় প্রচলিত আছে। ৯২ বছর আগের রিচুয়াল বর্তমান প্রজন্ম মেনে চলে। দুর্গা প্রতিমা এই বছর আবার একচালার সাবেকী ঘরানারই করা হয়েছে।

শেষাংশ গত সপ্তাহের পর

ভালবাসার আকাশ

ফারুক আহমেদ

৬.

কী করবে নন্দিতা মণ্ডল! সে যে নিরুপায়। হিন্দুত্বের গৌরবে তার মা-বাবা মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করতে চায়, প্রেম ভালোবাসা সম্প্রীতির হৃদয়ের কানাকড়িও মূল্য নেই তাদের কাছে। নন্দিতা কিছুতেই মানতে পারে না জাত-ধর্মের এই নিষ্ঠুর মানবতাহীন প্রগলভতাকে। তবুও মা বাবার গড়ে-দেওয়া এই বেড়া ভেঙে বেরোতেও পারে না। নীলকে ধরেই বাঁচতে চায় সে। অথচ নীলের আছে একটা অতীত, একটা বর্তমান — যা সমাজ ও ধর্মের শিকলে বাঁধা। নন্দিতা কিছুই পরোয়া করে না। সব বিধি-বন্ধন ভেঙে এক ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, নীলের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতে ইচ্ছে করে, নীল, এই ঘৃণার পৃথিবী ছেড়ে এই অসহিষ্ণুতার পৃথিবী ছেড়ে আমরা অন্য এক নতুন পৃথিবী গড়ে তুলি যেখানে মানুষ শুধু মানুষের পরিচয়ে বেঁচে থাকে, ধর্মের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে বেঁচে থাকে শুধু মানুষে- মানুষে ভালোবাসা, প্রেম প্রীতির এক স্বর্গীয় সৌরভ। পারে না, কোথায় যেন একটা খটকা লাগে। এক বিশাল শূন্যতার কারাগারে একটু একটু করে ডুবে যায় নন্দিতা মণ্ডল!

৭.

কলেজ জীবন শেষ করে ভালোবাসার নন্দিতাকে নিজের করে পাওয়ার জন্য নীল আসমান একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অফিস সেক্রেটারি পদে কাজ জোগাড় করেছে। নন্দিতার পরামর্শমতো কাজে যোগ দিয়েছে। সে মানুষের মতো মানুষ হওয়ার দৌড়ে ছুটে চলেছে প্রতিনিয়ত। শিক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে নীল রাত-দিন সোসাইটির কাজে আত্মনিয়োগ করে।

জীবনে চলার পথে জুটেছে কত তাচ্ছিল্যের শেল, কত যন্ত্রণা, তা কেউ বোঝে না। অবজ্ঞার পাহাড় মাথায় নিয়ে পবিত্র ভালোবাসার অপেক্ষায় প্রহর গুনে গুনে রাত কাটে দিন কাটে নীল আসমানের।

অবচেতন মনে বলে চলে নীল— ফিরে এসো নন্দিতা। প্রেসিডেন্সি কলেজের দিনগুলো মনে পড়ে ফেলে-আসা সেই সব দিনের কথা। নন্দিতা মণ্ডলের অফুরন্ত শুভকামনায় প্রথম চাকরি পাওয়া। তবুও নন্দিতাকে না-পাওয়ার সকাল আসে। সূর্য ওঠে। খাদহীন প্রেম টলমল করে নীল আসমানের বুকে। সাংকেতিক প্রেম বিনিময়ের জায়গার নামগুলো এসপি, বনবিতান, কিডোম, স্মৃতিচিহ্ন, মনে পড়ে শপথ নেওয়ার কথা। শপথ রক্ষা করতে-না-পারার যন্ত্রণায় ছটফট করে দু'জনেই।

নীল আসমান স্বপ্নের মধ্যে বিড় বিড় করে কত কথা বলে— এই নাও তোমার জন্য উদার বিস্তীর্ণ খোলা আকাশ। ভাবনার আসমান জুড়ে ভেসে ওঠে এ কার ছবি? কোন ছবি? বেলা অবেলায় এ কোন আত্মশুদ্ধি?

নীলের লেখা না-পাঠানো-খামে ভালোবাসার চিঠি। কত সুপ্ত প্রতিভার স্ফূরণ দেখি তোমার অণুপ্রেরণায়। মনে পড়ে ফেলে-আসা-দিনের সেই সব ভালোবাসার মুহূর্তগুলোকে। মুষ্টিবদ্ধ হাতে জেগে ওঠার আহ্বান। ভালোবাসা প্রেমের গান। আইএসএসএন নম্বরের জন্য উৎসাহ দিলে। আবেদন মঞ্জুর ২৩২০-৩৪৯৮।... এক সঙ্গে উদার আকাশের নিচে হাতে হাত রেখে পথচলা। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কত জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার আনন্দ— সেই সব স্মৃতি আজও খুঁজে ফিরি। কলেজ ব্যাগে নিজের হাতে বসানো গাছের সবজি, পাতিলেবু, আম, জামরুল, সবেদা কত কী নিয়ে আসতে মনে পড়ে নন্দিতা? কখনও কিছু খেলেই মনে পড়ে তোমার মুখ। যদি কাছে থাকতে, কলেজ জীবনের মতো টিফিন খাওয়ার মতো দু'জনে শেয়ার করে খেতাম।

নীল আসমান চাকরি করতে করতে দূরশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে এমএ পাশ করে। নিষ্ঠার সঙ্গে এডুকেশন সোসাইটির সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করার কাজে মন দেয়। নীলের উদ্যোগেই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফুলে ফেঁপে ওঠে। তার অক্লান্ত পরিশ্রমে তাদের স্কুল ও কলেজ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। নতুন বিএড এবং এমএড কলেজের অনুমোদন আসে তার হাত দিয়েই। সে সব অতীত ইতিহাস। একটা গ্রামকে শিক্ষানগর করে গড়ে তুলতে নীল আসমানের ভূমিকা ছিল অনেক। আজও বসন্তপুর গ্রামের মানুষের ভালোবাসা নীল আসমান ভুলতে পারে না। সেই গ্রামের সব থেকে ভালো মানুষ ছিলেন ইসারুদ্দিন ফকির নামে এক নেক বান্দা, তাঁকে সবাই আজও ভালোবাসেন। তাঁর কবরস্থান মসজিদের পাশেই ছিল অনাদরে। নীল আসমান সেটা নিজেই খরচ করে উদ্যোগ নিয়ে চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে এবং একটা নামের ফলক লাগিয়ে দিয়েছে। সেটা এখন একটা মাজারে পরিণত হয়েছে। সেখানকার ফলকে লেখার সময় নীল আসমান লিখিয়েছিল, 'ইসারুদ্দিন সাহেব ভালো মানুষ ছিলেন, আজও সবাই তাঁকে ভালোবাসেন'...। দু'বছর-তিন বছর পর নীল আসমান সেই কবরস্থানের পাঁচিলটি রং করিয়ে দেয় নিজের উদ্যোগে। প্রতি শুক্রবার, সবেবরাতের দিনে এবং ইদের নামাজ আদায় করা হলে গ্রামের প্রায় সমস্ত মানুষ ইসারুদ্দিন সাহেবের কবরস্থানে গিয়ে কবর জিয়ারত করেন এবং পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার কাছে মার্জনা চেয়ে নিয়ে দোয়া চান দেশবাসীর কল্যাণে এবং নিজ পরিবারের সদস্যদের জন্য, নিজের জন্য।

কচি কলাপাতার মতো নরম হাতে হাত, চোখে চোখ রেখে আবারও নীলের অগ্নিশপথ। নতুন করে বাঁচার লড়াই। এবার নীল তাঁর প্রিয় নায়ক শাহরুখ খানের উপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করতে ভর্তি হয়েছে স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। একই বছরে নীল আসমান তার মেধার প্রমাণ দিয়ে নেট ও সেট দুটো পরীক্ষায় সফল হয়েছে। ভাঙড় হাইস্কুলের বায়োলজির আদর্শ শিক্ষক গিয়াসউদ্দিন হালদার, রসায়ন বিভাগের শিক্ষক মাসাদুর রহমান আর ঘটকপুকুর হাই স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক মুক্তময় মণ্ডল, শারীর শিক্ষার শিক্ষক সেলিম আহমেদ নীল আসমানকে সবসময়ই উৎসাহিত করতেন। মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে হলে মাটির মানুষের সেবায় এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষকদের সঙ্গে পিতা-মাতার উৎসাহ পেয়ে নীল আসমান নিজেকে মানুষ হওয়ার দৌড়ে শামিল করেছে। কাজের অফিসের আর্কিটেক্ট সবিতা দত্ত'র দুঃখের কথা শুনে নীলের চিবুক ভিজে একাকার হয়ে যায়। সোসাইটির বস সরকারের বিরুদ্ধে এবং জমি দিয়ে চাকরি নেওয়া কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের জন্য গ্রামের সাধারণ মানুষ ঘৃণা করেন। চতুর শৃগাল যেমন করে ফাঁদ এড়িয়ে শিকার ধরে ঠিক সেভাবেই সোসাইটির পরিচালক তথা আজন্মকাল বস মানুষকে ফাঁদে ফেলে তার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই থাকে। মাঝে মধ্যে এলাকায় পেলে প্রতারিত মানুষ রেগে গিয়ে গণধোলাইয়ের আয়োজন করলে উল্টে প্রতারিত মানুষরাই কেস খায়। সকলের সাহায্য নিয়ে গড়ে ওঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তা এখন হয়ে গেল বসের আত্মীয়দের লুটেপুটে খাওয়ার সোনার ডিম পাড়া হাঁস। চোখের জলে বিদায় নেওয়া শিক্ষক থেকে কর্মচারীদের অভিশাপ বসকে তাড়া করে। কলেজ স্কুলের শিক্ষিকা আবেদা সুলতানা থেকে ইরা বেগমকে বিনা দোষে তাড়িয়ে দেওয়া এবং হেনস্তা করার পাপ থেকে মুক্তি পায় না সোসাইটির কর্ণধার নজর মণ্ডল। তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে থাকে দিনের আলোয় সাধারণ মানুষের হাতে চরমভাবে অপমানিত হয়ে এবং হেনস্তার শিকার হয়ে।

এক রাতের ঘটনা মনে পড়ে গেল নীলের। ২০০৬ সালের পৌষ মাসের সন্ধ্যা। বেশ শীত শীত ভাব। আর শীতকালে পাড়া গ্রামে সন্ধ্যা নামলেই মনে হয় গভীর রাত। তখন সন্ধ্যা সাড়ে আটটা হবে। নীল তার অফিস সংলগ্ন ঘরেই ছিল। হঠাৎ মনে হল বস তো সকালে কলকাতা থেকে এসেছেন। এখন দেখা করলে অনেক দরকারি বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। নীলের ঘর থেকে বসের বাসস্থান দু'তিন মিনিটের। নীল দ্রুত রেডি হয়ে বেরিয়ে গেল। বসের বাড়ির সদর দরজা বলতে একটা বাঁশের বেড়া। সেটা ঠেলে ধীরে ধীরে বসের বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেল নীল।

বস দোতলায় থাকেন। সিঁড়ির কাছে গিয়ে নীল দেখতে পেল বেশ কয়েক জোড়া চটিজুতো সিঁড়ির মুখে খুলে রাখা আছে। নীলের মন খুশিতে ভরে উঠল। তাহলে সোসাইটির সদস্যরা এসেছেন দেখা করে আলোচনা করতে। ভালোই হবে। সবার সামনে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।
নীল আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল। বসের ঘরের দরজা কিছুটা ভেজানো। দরজা ঠেলতে গিয়েও একটু থেমে ভেতরের দিকে উঁকি মেরে দেখতে চাইল কোন কোন সদস্য ভিতরে আছে। কিন্তু কী দেখছে নীল?

ঘরের ভিতরে বসে আছে বসের সব ভাই, ভাতিজা, ভাগনে আর এক বোন। সোসাইটির কোনও সদস্য সেখানে নেই। সবাই একাগ্র চিত্তে বসের কথা শুনছে। বস বলে চলেছেন, ''এই যে নেফজা (নিফাজ) তোর জন্য আমার মুখ দেখানো ভার। তুই তোলাবাজদের মতো সোসাইটির ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা তুলে নিচ্ছিস। কত টাকা তুলছিস? দু'হাজার, পাঁচ হাজার বড়জোর দশ হাজার। এতো ফকিরের ভিক্ষা রে। এতে তোদের পেট ভরছে না কিন্তু দুর্নাম হচ্ছে। এই সোসাইটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো তোদের জন্যচই করেছি, নাকি ওপাড়ার নাজম্যার জন্য করেছি? বল, ভেবে বল। কেবলই প্রতিষ্ঠান লাভের মুখ দেখেছে। এখন ধৈর্য ধরতে হবে। এখন যদি পকেটে করে টাকা আনিস তাহলে আর দু'বছর পর গাড়িতে করে টাকা আনবি। বুঝেছিস নির্বোধের দল।''

এই পর্যন্ত শুনে নীলের পা কাঁপতে শুরু করেছে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কালবিলম্ব না করে সে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল। সদর দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসে দরজা ঠেলে ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে তার মনে হল তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। সে ঢক ঢক করে আধ বোতল জল পান করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এ কী দেখল সে! কী শুনল! এ কি সত্যি নাকি তার মনের ভুল?

৮.

ভুলতে-না-পারা পাপ-কথন। আকাশ-কাড়ার মিছিলে ওরা কারা? ওরা ছুটছে... ওদের বিরামহীন ছুটে-চলা দেখে গর্জে ওঠে নীল আসমানের বিবেক। রুখে দেওয়ার মিছিলে পথ হাঁটে। বিভেদকামী শক্তিকে প্রতিহত করতে লিখে ফেলে মহান সহিষ্ণু উদার ভারত কথা। মা-মাটি-মানুষের মহান নেত্রীর দলের জয় সুনিশ্চিত করতে নীল আসমানও পথে নামে। সক্রিয় সদস্য হয় দলের। পুরনো সরকারকে উৎখাত করতে কলম ধরে। অনেক বছর আগে থেকেই লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করত সে। তার পত্রিকার নামেই প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান থেকে ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মূল্যবান সব গ্রন্থের সম্ভার। সেগুলিও জনমত গড়ে তুলতে থাকে। এরকমই একটি বইয়ের কারণে নীল আসমানের উপর নেমে এল ক্ষমতাসীনদের অত্যাচার। তার পরিবারের সদস্যদের হতে হল হেনস্তা। তবুও সে তার লড়াই-সংগ্রাম জারি রাখল। এমনি করতে করতে ভোট এসে গেল। বিরোধী জোটের পক্ষে গেল মানুষের রায়। দীর্ঘ অপশাসনের অবসান ঘটাতে নীল আসমানের প্রয়াসও একরকম ইতিহাস হয়ে গেল। বাংলার মানুষের মনে দাগ কেটে গেল নীল আসমানের কালজয়ী সব প্রয়াস। সুস্থ সমাজ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে সে এগিয়ে এসেছে, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করছে প্রতিনিয়ত।

খোলা জানালায় কত মুখের মিছিল। মার্বেল-শীতল টেবিল আর প্রকৃতির মধ্যে আজও সে খুঁজে ফিরছে নন্দিতা মণ্ডলকে। নীল আসমান খুঁজে ফিরছে আমবাগানের ফাঁক-দিয়ে-দেখা সেই অপরূপা চোখের ইশারায় ফুটে-ওঠা ভালোবাসা। যেন সাতরঙা আবির। বাঁচার আকাশ। এ দেখা কখনও শেষ হয় না নীলের। সে স্বপ্ন দেখে। ছবি আঁকে। হঠাৎ করে তার মনের ক্যানভাস জুড়ে ভেসে ওঠে এ কোন ছবি? কার ছবি? বেলা অবেলায় এ কোন আত্মশুদ্ধি? নন্দিতা, তুমি কোথায়?

শেষ চিঠি আজও পোস্ট করতে পারেনি নীল। হে আকাশচারিণী, মূল্যবান তারা হয়ে জ্বলজ্বল করছ পুব আকাশে। আকাশের দিকে তাকিয়ে নীল আসমান বলছে, তোমার জন্য এ বুকে আজও আকাশ রাখা। ভালোবাসা তোমার জন্য নিশিযাপন চোখবৃষ্টি থামিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। নন্দিতা... তুমি কোথায় হারালে ! তোমাকে দেখতে না পেয়ে 'তুমিহীনা এই ছায়াজীবন' অসহায়। বাংলাদেশের লেখক বন্ধু আহমেদ ফারুকের বই পড়ি বেদনার আকাশ থেকে বেরিয়ে আসতে। জানো হাজারো কাজের পর রাতে বালিশে মাথা রাখি তখন মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার জন্য চুল ও কপাল তোমার আঙুলের স্পর্শ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে তুমি আসো না। হুমায়ুন আহমেদের হিমু সমগ্র পড়তে পড়তেই দু'চোখের পাতা মুড়ে আসে।

ভোরের নিস্তব্ধতায়, পিউকাঁহা পাখির ডাকে আজও ঘুম ভাঙে। তখন তুমি দখিনা হাওয়ায় বিছানা ছেড়ে, শীতের চাদর জড়িয়ে চলে আসো আমার কাছে, লাল রঙের সোয়েটার আর কালো শালে শরীর মুড়ে। পরির মতো রাজকন্যা হয়ে। তখনও আধো ঘুমে, ভাঙা স্বপ্নে লীন হতে হতে হাতড়াতে থাকি মাটি। আলতোভাবে হাত রাখো কপালে।

লিচু ফুলে মৌমাছি তখনও খুঁজে ফিরছে মধু। অস্থির চোখে দেখা ঘড়ির চঞ্চল কাঁটা ঘুরে ঘুরে কখন হয়েছে সময়ের নদী। রাজকন্যা, তুমি যেন নদীর গুঞ্জরণে প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে আপন মনে গাইছে প্রেমের গান, কল্যাণপুর স্টেশনে।

একবার একগুচ্ছ লাল গোলাপ ছাড়াই জানিয়ে ছিলাম 'একুশের বাংলা ভাষায়', ভালোবাসি তোমায়।

পরীর মতো রাজকন্যা তখন তুমি ঠায় দাঁড়িয়ে, নির্বাক! আকাশের দিকে তাকিয়ে খুঁজছো শিমুল পলাশের মাঝে ভালোবাসার রং।

নতুন হাতে ড্রাইভিং, কাঁপা কাঁপা হাতে স্টিয়ারিং... তুমি পাশের সিটে। সেদিন কি আর কখনও ফিরবে না? নন্দিতা, এই ধর্ম এই সমাজ আমাদের এক হতে দেবে না?

ভালোবাসার আসমান জুড়ে এ কোন ছবি? কার ছবি? বেলা অবেলায় এ কোন আত্মশুদ্ধি?

৯.

হাজার অসহায় মানুষের জন্য নিরলসভাবে কাজ করতে থাকে নীল আসমান। সমাজসেবায় সুনাম অর্জন করেছে নীল আসমান। চারিদিকে তাঁকে নিয়ে এখন চর্চা হতে থাকে। প্রতি মাসে নিজের উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে সে পরিচিত মুখ। প্রতিনিয়ত মুমূর্ষু মানুষের সেবায় এগিয়ে আসে স্বাস্থ্য শিবির করতে। অসহায় মানুষের পরম বন্ধুর আর এক নাম হয়ে যায় নীল আসমান।

নীল আসমান আবারও স্বপ্নের মধ্যে বিড়বিড় করে— নন্দিতা তোমার জন্য বিস্তীর্ণ আকাশ। দিগন্তব্যাপী খোলা মাঠ। হাতে হাত রেখে প্রাণের বাংলা ভাষাতেই জানাই... ভালোবাসি তোমায়। নন্দিতা তুমি শুধুই আমার। তোমার জন্য, এ বুকে আজও ভালোবাসার আকাশ রাখা। ভালোবাসার জন্য বাঁচো, বাঁচার মতো বাঁচো। অনন্ত ভালোবাসা নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। ক্লাসের চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রকৃতি উদ্যানে অপলক চেয়ে থাকা তোমার চোখ এখনও কি সেই আগের মতো একই রকম আছে! এখনও কি স্বপনের বিভোর হয়ে চমকে ওঠো ঘুমের মধ্যে সেই আগের মতো। আজও কি খবরের কাগজে ছবি দেখে আনন্দের অনুভূতি প্রকাশ করতে চোখে জল চলে আসে। তোমার নীল আসমানকে ছেড়ে চলে গেলে দূরে বহু দূরে আর কি কখনও দেখা হবে না দু'জনের। ফিরবে না এ-বুকে আদরহীন শবদেহে হতে হবে লীন।

আমাদের ভালোবাসার একটা চুম্বন অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে কখন অপেক্ষালয় হয়েছে জানা হয়নি। তোমার অ্যাডমিট নিয়ে দুষ্টুমির জন্য আজও অনুতপ্ত। এই চোখের দিকে তাকাও। অফুরন্ত সৃষ্টি খেলা করে দু'চোখে। মেরো না, বাঁচতে দাও। চেয়ে নাও... মিত্রতা-ভালোবাসা-মনুষ্যত্ব-মানুষ। অবাঞ্ছিত ভেবে ঘৃণা করো না। জেনো অবাঞ্ছিত শুঁয়োপোকা আজও প্রজাপতি হয়।

জানো নন্দিতা, অনেক বছর পেরিয়ে গেল, মানুষ স্বাধীন হয়েছে। আজও আমরা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ভুবন গড়ে তুলতে পারিনি। বিশ্ব জুড়ে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, সম্প্রীতির বন্ধন অগ্রাহ্য করে বেড়ে চলেছে হানাহানি। মানুষ কবে আর মানুষ হবে? প্রকৃতি ব্যুমেরাং। মোকাবিলার বিজ্ঞান কই? তাদের ভেতর তোমাকে হারাতে চাই না। তুমি জেগে থাকো, চেয়ে থাকো, ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকো আমার দিকে, সঙ্গে থাকো ভালোবাসার মুহূর্তগুলোকে স্মৃতি করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। ভালোবাসা না পাওয়ার অপূর্ণতায় বেঁচে থাক সন্তানহীন মায়াহীন শরীর জুড়ে।

স্বপ্নের রেশ কাটতে-না-কাটতেই মোবাইলের রিংটোন বেজে ওঠে 'আমারও পরাণ যাহা চায় তুমি তাই...' শুনে ঘুম ঘুম চোখে বিছানা থেকে উঠে পড়ে নীল। চারিদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন সূর্য দেখা যায় না। মেঘে ঢেকে-রাখা আকাশ। বৃষ্টি নামে ঝমঝম করে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়ায় নীল। সে অনুভব করে নন্দিতার ভালোবাসা আকাশ স্পর্শ করে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে... নীল ভিজতে থাকে ভিতর ও বাহিরে। শবনম মানে শিশির বিন্দু। শবনম শিশির বিন্দু হয়ে ভিজিয়ে দিয়ে যায় মনের আকাশ। বাঁচার আকাশ জুড়ে শবনমের ভালোবাসা।

সুহিনার আকা

যে পুজোয় আর ফেরা হয় না

লতিফ হোসেন

একটি সংবাদ পত্রের প্রতিবেদনে পড়ছিলাম— ‘সম্প্রীতির পুজো কোচবিহার দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি ক্লাবে’। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম। এমনকি পুজোর সভাপতি যিনি, তিনিও একজন মুসলিম। হ্যাঁ দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি ক্লাব বলতেই আমাদের ক্লাব। আমাদের পুজো। সম্প্রীতির এই মেলবন্ধন যে অর্বাচীনকালের, তা তো নয়। এ তো প্রবহমান স্রোত। এর শেকড় আমাদের যাপন ইতিবৃত্তের গভীরে লুকিয়ে রয়েছে। মনে রাখতে হবে রাজ-শাসিত কোচবিহারের অতীতকে। কোচবিহারের ইতিহাস, সম্প্রীতির ইতিহাস তো বটেই। শহরের প্রাণকেন্দ্রে বিশালাকার নতুন মসজিদ, পুরাতন মসজিদ, ডেয়ারি ফার্মের মসজিদ, পিলখানা মসজিদ, কলাবাগান গোরস্থানের অবস্থান প্রাচীন রাজন্যবর্গের পরধর্ম সহিষ্ণুতার দিকটিকেই উজ্জ্বল করে। এখনো দেবোত্তর ট্রাস্টের সহায়তায় হরিণচওড়ায় মহরম উৎসব পালিত হয়। রাসচক্র বংশ পরম্পরায় নির্মাণ করে চলেছেন আলতাফ মিয়াঁরা। সম্প্রতি তার অসুস্থতার খবর সামনে এসেছে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক উদাসীনতা আমাদের ভাবিয়েছে। সম্পর্কের টানাপোড়েনে চড়াই-উৎরাই থাকবেই। যে টুকু মন্দ, তা বাহ্যিক। ভেতরে ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে মিলনের সুর, যা সহাবস্থানের সোপানকে নির্মাণ করে। মনে রাখতে হবে কোচবিহারের ভূমিপুত্র মুসলিমরা নস্যশেখ। এরা রাজবংশী মুসলিম। নৃতাত্ত্বিক ভিত্তিটিকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই। জীবন-যাপন, খাদ্যাভ্যাস, রিচুয়ালসের মাপকাঠিতে বহুল সাদৃশ থাকবে— এটাই স্বাভাবিক। বিশেষত রজবংশী হিন্দুদের সাপেক্ষে। শুটকি-সিদল-প্যালকা-ছ্যাকার খাদ্যাভাসে, ভাওয়াইয়ার সুরে ধর্মীয় চাদর ছিন্নভিন্ন হয়ে, মানুষে মানুষে সহাবস্থান, কৃষ্টি কিংবা নৃতাত্ত্বিক সমানুভূতিই মুখ্য হয়ে ওঠে। আমাদের ভাবতে শেখায়— কেবল ধর্মীয় মিল মানুষকে মেলায় না, ভাষা কিংবা সংস্কৃতির শেকড়েই গাঁথা হয় আত্মপরিচয়ের নিগূঢ় সোপান। তাকে আঘাত করা সহজ কিন্তু মুছে ফেলা দুঃসাধ্য। কাজেই আজ যখন ‘সম্প্রীতি’র শিরোনামে প্রতিবেদন লেখা হয়, তখন তা বড্ড বেশী বানানো মনে হয়। বিজ্ঞাপনের মতো শোনায়। ঘরের সন্তানকে ‘সন্তান’ হিসেবে প্রমাণ করবার জন্য নিশ্চয়ই আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই, সেটা তো জন্মগত।

অতীতগুলি জমতে থাকে স্মৃতির চরে। ছেলেবেলা, মহালয়া, পুজো প্যাণ্ডেল, লাইটিং এসবের চাইতে বড়ো আনন্দ সারা বছর আর তেমন ছিল না। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কোনও কালেই আমাদের বাড়িতে ছিল না, আজও নেই। ঈদের মতো পুজোর দিনগুলির জন্যেও সম্বৎসর চাতক হয়ে চেয়ে থাকতাম। স্কুলে, টিউশনে, অন্য পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে ফাটিয়ে তর্ক আর সমালোচনা— ‘আমাদের পাড়ায় এবার এটা, তোদের পাড়ায় তো যেমন তেমন’। মৌখিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের পাড়াকে না জেতাতে পারলে শান্তি নেই। কোনও কোনও বার তেমন কিছু না থাকলেও, ভালো কিছু একটা ইস্যু খুঁজে খড়কুটো ধরে যেন নদী অতিক্রম করে যাবার মতো লড়াই করে যেতাম। হেরেও যে যাই নি তা নয়, তবুও নিজের পাড়া, নিজেদের পুজো— এরকম একটা অনুভূতি মিশে থাকতো চোখে-মুখে-মনে। যেবার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ সে বছর আমাদের মাধ্যমিক, জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষা। তার আগের বছর আমাদের পাড়ায় প্রথম চন্দন নগরের আলো নিয়ে আসা হল। এগারোটি বড়ো বড়ো আলোর তোরণ। শহরের প্রধান প্রবেশ সড়ক হওয়ায় যানজট এড়াতে সারা রাত ধরে হলুদ আলো জ্বালিয়ে বাঁশ বাঁধার কাজ চলত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিন জায়গার মানুষগুলিকে দেখতাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। মনে মনে ভাবতাম এদের কি ঘর নেই! পুজো নেই! পরিবার নেই! আনন্দ নেই! তাদের মধ্য থেকে জনৈক এক কাকু বলেছিলেন— ‘তোমাদের এই চারদিনের আনন্দ দিয়েই আমাদের সারা বছরের আনন্দ ঘরে আসে বাবু’। সে কথায় নোনাজল ছিল, সে জলে আমিও ভিজেছি। এমনতর অজস্র কত মুখ চেয়ে থাকে এই দিনগুলির জন্য, তখন ভেবেছি। এসব ভাবলেই বাবার মুখখানি খুব মনে পড়ে। প্রায় দিন আনি দিন খাই-এর সংসার আমাদের। বাবা কখনো দোকানে দোকানে সিগারেট ফেরি করেছেন, কখনো এনবিএসটিসিতে টায়ার ধোয়ার কাজ, কখনো অন্যের দোকানে কর্মচারী। তারপর আমাদের নিজেদের রান্নার গ্যাস সার্ভিসিং-এর দোকান হল, সঙ্গে জেরক্স মেশিন। বাবার হাতে অজস্র কালো কালো দাগ দেখেছি। সবগুলিই সার্ভিসিং করতে গিয়ে কেটে যাবার দাগ। বাবার সেই পরিশ্রমী মুখ আর ভিনদেশ থেকে আগত আলোক-শিল্পীদের ঘর্মাক্ত মুখের কোনও ভেদ খুঁজে পাই নি। একবার অষ্টমীর দিন, সেবার বাবার ভীষণ জ্বর, পাশের বাড়ির কাকিমা এসে আমাকে আর দিদিকে ডেকে বললেন— ‘রাজা-পিংকি ভালো ড্রেস পরে আয় ঘুরতে যাব’। দিদির গায়ে তখন গত ঈদে কেনা লাল লাল ফুলের ফ্রক জামা। একথা শুনে দিদি মুখ কালো করল। দিদি আমার হাত ধরে বাড়ি নিয়ে এলো। দিদির পরিহিত লাল ফুল তোলা জামাটিই ছিল সবচেয়ে ভালো জামা, এর বাইরে আর কোনও ভালো পোশাক নেই। আমারও তাই। সেবার আর ঘুরতে যাওয়া হয় নি। দাদিমার ঘরের পলেস্তারা খসে পড়া খুঁটি ধরে সেবার খুব কেঁদেছিলাম। পাশের বাড়ির লোকেদের রকম রকম পোশাকের বহর হাঁ-চোখে দেখতাম। ভাবতাম আমাদেরও একদিন অনেক জামা হবে। খুব মনে পড়ে একবার পুজোয় রাসমেলা মাঠের ধারে শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বসে পেট ভর্তি লুচি খাবার কথা। বাবা-মা-দিদি-আমি। সেবার স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তুলেছিলাম। মায়ের অনেক দিনের শখ। ছবিখানি এখনও আলমারিতে তোলা আছে। মা-দুগ্‌গার মতো পারিবারিক ফ্রেম। শুধু ছেলে-পুলের সংখ্যা কম। হরিশপাল মোড়ের কারগিল যুদ্ধের থিম, পুরাতন পোষ্টঅফিস পাড়ার আকাশ ছোঁয়া মণ্ডপ, এসি ডিসি ক্লাবের ভাসমান নৌকার প্রতিমা খুব মনে পড়ে। একবার টেকো মাথার কানে দুল পরা অসুর দেখেছি ধর্মতলা ইউনিটে। বড়ো দেবীবাড়ির প্রতিমা দেখবার শখ আমার প্রতিবারের। দাদিমার কাছে কত গল্প শুনেছি। শুনেছি মানুষ বলি হতো একসময়। দাদিমা বলত— ‘খুব জাগ্রত দেবী’। এখনও মহিষ, পায়রা, ছাগ বলি হয়। পুজো ঘিরে মেলা বসত। নানান পদের খাবার। বাবুরহাটের গরম জিলিপির কথা ভেবে এখনও মুখে জল আসে। পাশে শুঙশুঙির বাজার হয়ে ছোটো দাদির বাড়ি যেতাম কোনও কোনও বার। বাবার ছোটো পিসি। এখন বেঁচে নেই। শুধু স্মৃতিগুলি ভুটান পাহাড়ের মতো জমতে থাকে। ডি ডি বাংলায় মহালয়া দেখবার জন্য আগের দিন রাতে মা দাদিমাকে পই-পই করে বলে রাখতাম— যেন ডেকে দেওয়া হয়। ডাকতে হতো না। নিজে থেকেই উঠতাম। তখন তো রঙ-টিভি ছিল না। এন্টেনা ঘোরানো সাদা-কালো ঝিরঝিরে ছবিতে ‘ভদ্র বাবু’র গলায় এক আকাশ মুক্তি খুঁজে পেতাম। বাবা সেদিন পড়ার জন্য চাপ দিতেন না। দিদিভাই আর আমি মিলে খুব মজা করতাম। বন্দুক কিনবার খুব শখ। বুড়িমার আর সিংহ মার্কা গুলি, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। গুলি বেশী থাকত না। এক-আধ প্যাকেট বাবা যেটুকু কিনে দিতেন, সেটুকুই সম্বল। বন্ধুদের নামিদামি খেলনা বন্দুক দেখে, চোখে লোভের প্রলেপ পড়ত। তবে কালো প্লাস্টিকের ট্রিগার দাবানো গর্‌গর্‌ শব্দের বন্দুকে আমার বিরক্তি ছিল। বাবা পুরানো জং ধরা বন্দুকের তেল দিয়ে দিতেন। যতই আর্থিক সমস্যা থাকুক, তবুও মন যেন কিছুতেই বুঝত না। মা বলতেন— ‘আগে নিজে বাবা-মা হ, তখন বুঝবি!’ মন না চাইলেও তেল দেওয়া জং ধরা বন্দুকেই খুশি হয়ে নতুনের সাধে কবর দিতাম। অষ্টমীর ভোগ আসত বাড়িতে ক্লাব থেকে। বাড়িতে কতবার নানান পদের খিচুড়ি রান্না করত দাদিমা, তবুও সেই ভোগের ঝুনা-খিচুড়ির স্বাদ অমৃতের মতোই মনে হত। প্রতি বাড়ির জন্য এক প্যাকেট বরাদ্দ থাকত। চেয়েচিন্তে আরেক প্যাকেট জুটিয়ে নিতাম ক্লাব কাকুদের থেকে। এই তো ক’দিন আগের কথা এসব। ক’দিনেই মনে হয় বুড়িয়ে গেছি। অধ্যাপনার কাজে এখন বাড়ি থেকে অনেক দূরে, সরকারি কাজের দায়। আর্থিক অস্বচ্ছলতা আর নেই বললেই চলে। কিন্তু হৃদয় জুড়ে ছেয়ে আছে যন্ত্রণা। হারিয়ে ফেলবার যন্ত্রণা। বড্ড ছুঁতে ইচ্ছে হয় সেই জঙে ধরা তেল দেওয়া বন্দুকখানি। পরতে ইচ্ছে করে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার জন্য বরাদ্দ একমাত্র পোশাকখানিই। আজ অনেক পোশাকের ভিড়ে সেই পোশাকটিই যেন খুঁজতে থাকি। হয়ত আজীবন খুঁজে যাব। কিন্তু খুঁজে পাব কি!...

তার আগের বছর আমাদের পাড়ায় প্রথম চন্দন নগরের আলো নিয়ে আসা হল। এগারোটি বড়ো বড়ো আলোর তোরণ। শহরের প্রধান প্রবেশ সড়ক হওয়ায় যানজট এড়াতে সারা রাত ধরে হলুদ আলো জ্বালিয়ে বাঁশ বাঁধার কাজ চলত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিন জায়গার মানুষগুলিকে দেখতাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন